গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ২১ সংখ্যা | ৪ - ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

পাশ-ফেল ঃ রাজ্য আর কতদিন কেন্দ্রের দোহাই দেবে

৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে সামিল হোন

এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালু সহ জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে কলকাতায় ৩০ জানুয়ারি মহামিছিলের ডাক দিয়েছে।

পাশ-ফেল চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাজ্য সরকার রক্ষা করেনি। কর্মসংস্থান শূন্যে নেমে এসেছে। সরকার মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে চলেছে। চাষিরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, প্রতিদিন কোনও না কোনও কারখানা বন্ধ হচ্ছে, শ্রমিকদের উপর চাপানো হচ্ছে নিত্যনতুন কালাকানুন। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে জনজীবনে নাভিশ্বাস উঠছে। এরই প্রতিবাদে মহামিছিলের ডাক।

দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চার সদস্যের এক প্রতিনিধি দল চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই পাশ-ফেল চালু করার দাবি জানাতে ২৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দাবি মেটানোর পরিবর্তে মন্ত্রীমশায় আবারও সেই পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এখনও সুস্পষ্টভাবে না জানানোর ফলে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি আগেও চিঠি দিয়েছেন এবং আবারও দেবেন।

কিন্তু চিঠি দেওয়ার কথা তাঁর এস ইউ সি আই (সি)-র ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার পর মনে পড়ল কেন? এতদিন তিনি চিঠি দেননি কেন? আর শুধু চিঠিই বা কেন, যদি তিনি আন্তরিকভাবেই মনে করেন পাশ-ফেল না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে, দু'ধরনের নাগরিক তৈরি হয়ে যাচ্ছে, এমনকী সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলি উঠে যাচ্ছে, তবে তিনি কিংবা তাঁর সরকার এতদিন নিশ্চুপ থাকলেন কেন? ইদানিং তো কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তাঁরা দু'বেলা হুঙ্কার ছাড়ছেন, পাশ-ফেল চালুর দাবিতে তাঁদের কোনও হুঙ্কার শোনা গেল না কেন? মুখমন্ত্রী তো

২৭ ডিসেম্বর বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রীকে দাবিপত্র দিচ্ছেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক তরুণ নস্কর, ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও অধ্যাপক অনুরূপা দাস

কেন্দ্রে সরকার পাল্টে বিরোধীদের সরকার গড়তে উঠেপড়ে লেগেছেন। সাম্প্রদায়িক, জনবিরোধী,

চারের পাতায় দেখুন

মালিকি শোষণই শ্রমিকদের ধর্মঘটের পথে ঠেলে দিয়েছে

৮-৯ জানুয়ারি শ্রমিকরা কেন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, তা দাবি সনদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। বাস্তবে পুঁজিপতি-মালিকরা এবং তাদের গোলাম সরকারই শ্রমিকদের এই ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী আইন তৈরি, মজুরি হ্রাস বা বাঁচার মতো মজুরি না দেওয়া, শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার কেড়ে নেওয়া, স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ না করা ইত্যাদি অসংখ্য শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপ সারা দেশের কোটি কোটি শ্রমিককে এই ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেছে। মালিকরা সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যেই সর্বোচ্চ শ্রমিক শোষণের পথ নিয়েছে। ধর্মঘট এই শোষণের বিরুদ্ধেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। প্রচলিত আইন এই ধর্মঘটকে যে চোখেই দেখুক, ন্যায় এবং মানবিকতার বিচারে এই ধর্মঘট শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, শ্রমিকের অস্তিত্বের শর্ত।

মালিকরা বরাবরই ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। মালিকি চিন্তার প্রভাবে আরেক দল মানুষ ধর্মঘট বিরোধিতায় সুর মেলাবে। ধর্মঘটকে 'কর্মনাশা' বলে যারা বিদ্রুপ করে তাদের চোখে ধরা পড়ে না মালিকের 'লকআউটে' কত কোটি শ্রমদিবস নষ্ট হয়, উৎপাদন ব্যহত হয়। ধর্মঘটে দিন-আনা দিন-খাওয়া মানুষের কত কষ্ট হয়, সে কথা তুলে ধরে যাঁরা প্রতিবেদন লেখেন, তাঁরা বাকি দিনগুলিতে অনাহার-অর্ধাহার-অপুষ্টিতে শ্রমিকের মৃত্যুর কথা ভুলেও বলেন না। ধর্মঘট হঠাৎ 'শ্রমিক দরদি' সাজা, এই ভণ্ডদের মুখোশও খুলে দেয়।

বিজেপির শ্রমিক সংগঠন বি এম এস বাদে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। কর্মচারীদের জাতীয় ফেডারেশন সমূহের যৌথ মঞ্চও ধর্মঘটের পথে সামিল হয়েছে। এই ধর্মঘটে বিএমএস-এর সামিল না হওয়ার ঘটনা দেখিয়ে দিচ্ছে শ্রমিক সংগঠন মানেই শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার সংগঠন নয়, বরং কোনও কোনও সংগঠন শাসকের হাতের ক্রীড়নক। তারা শ্রমিক দরদি সেজে শ্রমিকদের ভিতরে থেকে মালিকদের স্বার্থেই কাজ করে যায়।

২০০৯ সাল থেকে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলি প্রথমে পাঁচ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে ১০ দফা দাবি এবং বর্তমানে ১২ দফা দাবিতে দেশব্যাপী শ্রমিকরা যৌথভাবে কনভেনশন, সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, আইন অমান্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু

সাতের পাতায় দেখুন

কলকাতায় মিড-ডে মিল কর্মীদের বিশাল সমাবেশ। ২৮ ডিসেম্বর। সংবাদ আটের পাতায়

৮-৯ জানুয়ারি
ধর্মঘটের দাবি

১) মোদি সরকারের আনা শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি প্রত্যাহার,
২) মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ,
৩) সকলের জন্য চাকরি,
৪) ন্যূনতম ১৮ হাজার টাকা মজুরি,
৫) সমস্ত শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা,
৬) অবসরকালে সুনিশ্চিত পেনশন,
৭) অঙ্গনওয়াড়ি-আশা-মিড ডে মিল-প্যারা টিচার সহ সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কর্মীদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি ও এই সব প্রকল্পে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ,
৮) সম কাজে সম বেতন,
৯) শ্রম আইনগুলির কঠোর প্রয়োগ,
১০) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ বন্ধ,
১১) বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড আইনের সিলিং প্রত্যাহার, গ্র্যাচুইটির পরিমাণ বৃদ্ধি,
১২) আবেদনের দেড় মাসের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান।

ভোট আসে ভোট যায় মানুষের জলসংকট বাড়ে, জল-ব্যবসায়ীরা মুনাফার পাহাড় জমায়

বছর দুয়েক আগে প্রবল তৃষ্ণায় গভীর কুয়ো থেকে জল তুলতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের ভিদা গ্রামের দশ বছরের শচীন কেনজারের মারা যাবার ছবি দেখে শিউরে উঠেছিল মানুষ। খরার সময় ভারতের জলসংকটের ভয়াবহতা যে কী মারাত্মক হতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছিল এই ছবি। শুধু কি খরার সময় জলসংকট! রাজস্থানের ঢোলপুরে কুদিন্না গ্রামের শান্তারা গত ৪০ বছর ধরে মাথায় হাঁড়ি নিয়ে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে চলেছেন শুধুমাত্র আধহাঁড়ি জল সংগ্রহ করতে। সরকার আসে সরকার যায়, কিন্তু প্রতি রাতে জলের খোঁজে শান্তাদের হেঁটে চলা থামে না। অথচ মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে চম্বল নদী। স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও কোনও দেশপ্রেমিক (!) সরকারের মনে পড়ল না সামান্য পাইপলাইন স্থাপন করে ওই এলাকার মানুষকে, রাজভোগ-বিরিয়ানি নয়, একটু জল দেওয়ার কথা। এটা শুধু কোনও একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের ছবি নয়, সমগ্র দেশ জুড়েই এই অবস্থা। আমাদের রাজ্যও বাদ নেই।

বিশুদ্ধ জল পাওয়া মানুষের অন্যতম অধিকার। অথচ পরিবেশবিদদের মতে দেশে পরিস্রুত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত মানুষের সংখ্যা ১৬ কোটিরও বেশি। স্বাধীনতার সময়ে জনপ্রতি জল পাওয়া যেত বছরে ৬০৪২ ঘনমিটার। তা ক্রমাগত কমতে কমতে ২০১৬-তে দাঁড়িয়েছে জনপ্রতি বছরে ১৪৯৫ ঘনমিটার। এক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে আছে নাইজিরিয়া এবং ইথিওপিয়াও। মোদি সরকারের আমলে গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু দিনে চল্লিশ লিটার পরিস্রুত জল দেওয়ার প্রকল্পও মুখ থুবড়ে পড়েছে। ভারত এই মুহূর্তে ইতিহাসের প্রবলতম জলসংকটের মুখোমুখি। সম্প্রতি নীতি আয়োগের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৬০ কোটির ওপর ভারতীয় ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন। প্রতি বছর কমপক্ষে দু'লক্ষ মানুষ পানীয় জল সংকটে মারা যায়। আগামী দিন আরও ভয়ংকর। ২০৩০-এর মধ্যে জল সরবরাহ দ্বিগুণ না বাড়ালে আরও লাখো লাখো মানুষ জলসংকটের মুখোমুখি হবে। 'কম্পোজিট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স' শীর্ষক ওই রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ি। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ২০২০ সালের মধ্যে দেশের ২১টি প্রধান শহর প্রবল জলসংকটের সম্মুখীন হবে। এর ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ১০ কোটি ভারতীয়।

একদিকে জলসংকটে জেরবার হচ্ছে সাধারণ মানুষ, অপরদিকে সেই সংকটকে কাজে লাগিয়ে মুনাফার পাহাড় জমাচ্ছে মিনারেল ওয়াটার ব্যবসায়ীরা। এক লিটার জলকে বোতলবন্দি করতে ৫ লিটার জল খরচ হয়। অর্থাৎ ৪ লিটার নষ্ট। এতে খরচ হয় ৩ থেকে ৪ টাকা। অথচ বাজারে বিক্রি হয় লিটার পিছু ১৫ থেকে ২০ টাকায়। একদিকে বিশাল জলসংকট অন্যদিকে তাকে কাজে লাগিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার জলের ব্যবসা। সাধারণ মানুষের সর্বনাশ আর জল ব্যবসায়ীদের পৌষ মাস।

ভোট এলে রাজনৈতিক দলগুলি অন্যান্য সমস্যার মতো পানীয় জলের সমস্যা মেটাবারও আশ্বাস দেয়। কিন্তু বাস্তবায়িত হওয়া দূরের কথা, সমস্যা আরও বাড়ে। ভারতের মতো নদীবহুল দেশে এইরকম জলসংকট কেন? ১৯০ হাজার কোটি ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন নদ-নদীর মাত্র ৭০ হাজার কোটি ঘনমিটার জল আমরা ব্যবহার করি। বাকিটা চলে যায় সমুদ্রে। কেন তাকে কাজে লাগানো যায় না? আসলে একে কাজে লাগাতে গেলে দরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা আর পরিকল্পনা, যে দুটোরই অভাব রয়েছে সরকারের। শুধু কি তাই? উদারীকরণের আর্থিক নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু হয় দেশের মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডারগুলি লুটে নেওয়ার জন্য বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া। ২০০২ সালে বিজেপি সরকারের আমলে জাতীয় জলনীতিতে যে পরিবর্তন আনা হয় ২০১২ সালে কংগ্রেস সরকার তা সম্পূর্ণ করে। দেশের জলসম্পদের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় ব্যক্তিপুঁজির জন্য। মুনাফার গন্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা। সকলকে বিনামূল্যে পানীয় জল সরবরাহের গুরুদায়িত্ব থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। মানুষ ক্রমাগত হারাতে থাকে জলের ওপর তার ন্যায্য অধিকার— সমুদ্রের জলে, জলের পাড়ে সাগর-জেলেদের অধিকার, নদীর জলে মৎস্যজীবী, মাঝি, নদীতীরবাসীদের অধিকার। জল হারিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় উদাহরণ চাষের জমির তলার জল। সবুজ বিপ্লবের নামে কৃষিক্ষেত্রে এমন বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হল যাতে জল লাগল অনেক বেশি। আগে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে সেচব্যবস্থার উন্নতির কথা বলা হলেও আজ আর তা শোনা যায় না। যত পার জল টান মাটির তলা থেকে। বৃষ্টির জল বা স্বাভাবিক সেচের জলের বদলে শ্যালোর জল, তা না পেলে ডিপ টিউবওয়েলের জল। অন্য দিকে পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন আর নগরায়ণের ফলে জলাশয়, জলাধার, জলাভূমি রাতারাতি বদলে গেল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ে। সামাজিক বিষয়, সামাজিক মালিকানার 'জল' বদলে গেল ব্যক্তির বিষয়ে, ব্যক্তির অধিকারে থাকা জলে।

মহারাষ্ট্রে গ্রামের থেকে শহরের মানুষ ৪০০ শতাংশ বেশি জল পায়। দিল্লিতে বেশিরভাগ বস্তিতে জল দেওয়ার কোনও সরকারি পাইপ লাইন নেই। কলকাতাও এর বাইরে নয়। এখানে দৈনিক গড়ে ২০০ লিটার জল সরবরাহ হলেও বস্তিবাসী মানুষ পায় গড়ে মাত্র ৫০ লিটার।

আবার যতটুকু জল সরবরাহ হচ্ছে তাতেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রয়ে গেছে বৈষম্য। 'দ্য ন্যাশনাল কমিশন অন আর্বানাইজেশনে'র রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে জল সরবরাহ প্রবল বৈষম্যমূলক, যা ধনী ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালীদের স্বার্থে পরিচালিত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের বাস গ্রামে। চাহিদা এখানে বেশি অথচ সরবরাহ অনেক কম। শহরাঞ্চলে দৈনিক ১৩৫ লিটার আর গ্রামে ৪০ লিটার। মহারাষ্ট্রে গ্রামের থেকে শহরের মানুষ ৪০০ শতাংশ বেশি জল পায়। দিল্লিতে বেশিরভাগ বস্তিতে জল দেওয়ার কোনও সরকারি পাইপ লাইন নেই। গ্রামে ১৭.৯ শতাংশ আর শহরে ৬২ শতাংশ বাড়িতে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হয়। কলকাতাও এর বাইরে নয়। এখানে দৈনিক গড়ে ২০০ লিটার জল সরবরাহ হলেও বস্তিবাসী মানুষ পায় গড়ে মাত্র ৫০ লিটার।

জলের এই অভাব ও সমস্যার বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এর আসল কারণ অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ও দূষণের কারণের দিকে আমরা দৃষ্টি না দিই। ২০০৪-এ 'দ্য সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট' (সিএসই)-এর একটি রিপোর্ট থেকে পরিষ্কার যে ভারতে সব থেকে বেশি জল ব্যবহার করে বড় শিল্পগুলো, যা বড় বড় শিল্পপতিদের মালিকানাধীন। এর মধ্যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি ব্যক্তিমালিকানাধীন— আদানি পাওয়ার, জিন্দাল পাওয়ার প্রভৃতি। ভারতের সিংহভাগ জল অপচয় এবং দূষণ এদের সৃষ্টি। এদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা দূষণের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় তো দূরের কথা, কিছু দূষণরোধী ব্যবস্থা নিলেই পুঁজিপতিদের পুরস্কার (ইনসেন্টিভ) দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সরকার। অপর দিকে নাগরিকদের যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তার ৭০ শতাংশ দূষিত। জলের গুণমান সূচকে বিশ্বে ১২২টি দেশের মধ্যে ভারত ১২০তম স্থানে। সেই দূষিত জল পান করে মানুষের রোগ হচ্ছে। দেশে ৭২ শতাংশ রোগের কারণ বিশুদ্ধ জল সরবরাহে সরকারি ব্যর্থতা। আর সেই রোগের চিকিৎসায় ওষুধ ব্যবসায়ীদের বছরে ১০ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করলে এই ব্যবসার কী হবে? দুষ্টচক্রের চেহারাটি বুঝতে অসুবিধা হয় কি?

সমস্যার মূলে না গেলে সমাধান সম্ভব নয়। জলের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটা আসলে মালিকানার। যতদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান না ঘটবে, ততদিন সমস্যা বাড়বে যেমনটা বাড়ছে। উদারীকরণের বিষময় ফল হল পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তির একচেটিয়া অধিকার। জলেরও। জলের অভাবের প্রধান কারণ অসম বণ্টন ও অপচয়। যতদিন জলের ওপর ব্যক্তিমালিকানার অবসান হয়ে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন অপচয়, দূষণ আরও বাড়বে, বাড়বে অসাম্য আর জলসংকট। জলের অভাবে দীর্ঘতর হবে মৃত্যুমিছিল।

নির্ভয়া দিবসে নারী নির্যাতন রুখবার শপথ

২০১২-র ১৬ ডিসেম্বর দিল্লির শীতার্ত রাত কেঁপে উঠেছিল এক নৃশংস ঘটনায়। সেই রাতে প্যারামেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়াকে ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি নরপশুরা, অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছিল। ২৯ ডিসেম্বর মারা যায় মেয়েটি। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে দেশজোড়া বিক্ষোভ আন্দোলনের চাপে সরকার আনে ধর্ষণবিরোধী নতুন আইন। কিন্তু আজও বন্ধ হয়নি নারী নির্যাতন। নির্ভয়া ঘটনা স্মরণে ১৬-২৯ ডিসেম্বর রাজ্যে রাজ্যে এমএসএস, ডিএসও, ডিওয়াইও-র উদ্যোগে নারী নিগ্রহবিরোধী নানা কর্মসূচি পালিত হয়। (ছবিতে উপর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে) ২৯ ডিসেম্বর ত্রিপুরার আগরতলা, ২৪ ডিসেম্বর গুজরাটের আহমেদাবাদ ও ১৬ ডিসেম্বর বিহারের পাটনার কর্মসূচি।

মনীষীদের নাম আউড়ে ভোট কুড়োতে চায় বিজেপি

থমকে যাওয়া বিজেপির বিলাসবহুল বাসের 'রথে' নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, দিলীপ ঘোষের সাথে স্থান পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্রের ছবি।

আচ্ছে দিন, নোট বাতিল, কালো টাকা উদ্ধার, সব কা সাথ সবকা বিকাশ, বছরে দুই কোটি চাকরি সবই 'জুমলা, নিছকই ভোট প্রচার বলে ধরা পড়ে যাচ্ছে দেখে বিজেপি আঁকড়ে ধরেছে সাম্প্রদায়িকতাকেই। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে বড় মূর্তি, রামনাম থেকে হনুমানের জাত বিচার কোনও ফন্দিতেই বিক্ষুব্ধ মানুষের মন ঠাণ্ডা হচ্ছে না, বরং পাঁচ রাজ্যের ভোটে শোচনীয় পরাজয় দেখে বিজেপি নেতারা আগামী লোকসভা ভোটে বাংলার মন জয়ে তিন মনীষীকে আশ্রয় করে কিছু সহানুভূতি কুড়োতে চান। বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক তৈরির কর্মসূচিতে তাদের তিন নেতার সাথে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র কেন? বিজেপি যে ঘৃণার রাজনীতিকে আমদানি করছে সেই উগ্র-হিন্দুত্ববাদ, অন্ধ জাতীয়তাবাদের ভাবনার সাথে রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, এমনকী হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বিবেকানন্দের চিন্তার আদৌ কোনও মিল নেই। বরং বিজেপির 'ভারতীয়ত্ব' ভারতীয় নবজাগরণের মনীষীদের চিন্তার ঠিক বিপরীত!

বিজেপির রাজনীতি যার আদর্শে চলে সেই আরএসএস বলে, "হিন্দুস্থানের সমস্ত অহিন্দু মানুষ হিন্দুর ভাষা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, হিন্দু জাতির গৌরবগাথা ভিন্ন অন্য কোনও ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না।...এক কথায় তারা হয় বিদেশি হয়ে থাকবে, না হলে হিন্দু জাতির দেশে তারা থাকবে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনওরকম সুবিধা ছাড়া ও কোনওরকম পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবে না"(গোলওয়ালকর, উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড)। "হিন্দু সমাজে মিশে যেতে অস্বীকার করে বিদেশি থেকে গেছে যে মুসলমানরা, তাদের হয় দেশ থেকে বহিষ্কার করতে হবে অথবা পদানত করে রাখতে হবে"(ওই)। আরও বলেছেন, "আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সব কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসেবে এখানে বসবাস করেছে" (গোলওয়ালকর, চিন্তাচয়ন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪)। তাদের অন্যতম গুরু বিনায়ক দামোদর সাভারকর, যিনি ব্রিটিশের জেল থকে ছাড়া পেতে সারা জীবন তাদের সেবক হয়ে থাকার মুচলেকা দিয়েছিলেন, তিনি বলছেন, একমাত্র হিন্দুদেরই জন্মস্থান এবং আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ভারতে অবস্থিত। তাই তারাই এ দেশের নাগরিক, ক্রিশ্চান, মুসলিম ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা নন। এদেশে তাদের থাকতে হবে হিন্দুদের পদানত হয়েই।

এই যাদের 'ভারতীয়ত্ব' সম্বন্ধে ধারণা তারা বিবেকানন্দকে মানতে পারে? ধর্মীয় পুরুষ হয়েও বিবেকানন্দ বলেছেন, "পূর্বকালে 'হিন্দু' শব্দে (সিন্ধু নদের) অপর তীরের অধিবাসীগণকে বুঝাইত। তখন ওই শব্দের একটা সার্থকতা ছিল। কিন্তু এখন উহা নিরর্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ সিন্ধু নদের পূর্বদিকে এখন নানা ধর্মাবলম্বী নানা জাতীয় লোক বাস করে।" (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা)। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস? হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময় ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এদেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল" (সমাজ)। তাঁর মতে, "মুসলমান রাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এই জন্য মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায় পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংশ্রবে আমাদের সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকলা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া আসিয়াছিল" (ওই)।

বিবেকানন্দ বলছেন, "মুসলমানদের ভারতাধিকার দরিদ্র পদদলিতদের উদ্ধারের কারণ হইয়াছিল। দারিদ্র্য ও অবহেলার জন্যই আমাদের এক পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান হইয়া গিয়াছে" (বাণী ও রচনা— পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)। "...একথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।...বস্তুত জমিদার ও পুরোহিতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই উহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল" (ওই, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ২২)। বিবেকানন্দের ধর্মবোধ আর বিজেপির হিন্দুত্ব কি এক? বিবেকানন্দ বলছেন, "তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার মহম্মদের ধর্মে আবার ভাল কী থাকিতে পারে?... মুসলমান ধর্মে যথেষ্ট ভাল জিনিস আছে। মহম্মদ সাম্যবাদের আচার্য, তিনি মানবজাতির ভ্রাতৃভাব—সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ" (বাণী ও রচনা অষ্টম খন্ড, পৃঃ ১৯৪)। হিন্দু-মুসলমানে বৈরিতা ও হানাহানির বিপরীতে উদার ধর্মপ্রচারক বিবেকানন্দের আশা ছিল "মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়" ঘটবে (ওই, পৃঃ১৯৫)। এতেই আশার আলো দেখেছিলেন তিনি। এই বিবেকানন্দকে মানলে বিজেপিকে মানা চলে কি?

রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বলে, এদেশে পাশাপাশি বাস করা হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ এক। "ক্ষুধা মুসলমানকেও কাতর করে, প্রতিবেশী হিন্দুকেও রেহাই দেয় না। ক্ষুন্নিবারণ দু'সম্প্রদায়ই সমানে উপভোগ করে। এই ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি" (বিজলী পত্রিকার সম্পাদককে সাক্ষাৎকার)। নেতাজি সুভাচন্দ্র বসু বলছেন, "হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ পরস্পরের পরিপন্থী, এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁহারা খাঁটি কথা বলেন না।...খাদ্যাভাব, বেকারিত্ব, জাতীয় শিল্পের অবক্ষয়, মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব এগুলিই মূল সমস্যা।...এই সকল বিষয়ে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ অভিন্ন"(সুভাষ রচনাবলি, চতুর্থ খণ্ড)। তিনি আরও বলছেন, "হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া 'হিন্দুরাজ'-এর ধ্বনি শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা। দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী জনসাধারণের, কৃষক শ্রমিকের স্বরাজ সর্বাধিক প্রয়োজন"(ওই)। বিজেপির নীতি ঠিক এর বিপরীত। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের দুর্দশার কারণ হিসাবে মুসলমানদের দায়ী করে। নির্বিচারে এদেশের প্রকৃত নাগরিকদের শুধু ধর্মের কারণে বিদেশি-অনুপ্রবেশকারী তকমায় দাগিয়ে দিয়ে হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যত।

আদর্শগতভাবে, রাজনৈতিকভাবে, আর্থিক নীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ দেউলিয়া বিজেপির একমাত্র কর্মসূচি দাঁড়িয়েছে রামমন্দির নিয়ে জিগির তোলা। রামকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা। অথচ বিবেকানন্দ বলছেন, ধর্মের পৌরাণিক ভাগ তৈরি "অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী এবং অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ" নিয়ে। অর্থাৎ একজন ধর্মীয় পুরুষ হয়েও তিনি পৌরাণিক কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মনে করেন না (রচনাবলি, ১ম খণ্ড, পৃঃ৭৬)। তাই তিনি বলছেন, "রামায়ণের কথাই ধরুন— অলঙ্ঘনীয় প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ কখনও যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে"(রচনাবলি, ৯ম খণ্ড,পৃঃ২৯৭)। বিজেপি কিন্তু রামের জন্মস্থান পর্যন্ত নিখুঁতভাবে খুঁজে বার করে ফেলেছে! বিবেকানন্দ যদি আজ থাকতেন, বিজেপির এই ভোটের হিন্দুত্বকে দেখলে কী বলতেন তিনি?

আজাদ হিন্দ সরকারের ৭৫ বর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেতাজির মতো টুপি পরে নিজেকে তাঁর ভক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে তাঁর সংগঠন আরএসএসের ভূমিকা কী? বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' গ্রন্থে লিখেছেন, আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন লড়ছে, সেই সময় তিনি আরএসএস প্রধান কেশবরাম হেডগেওয়ারের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেছিলেন নেতাজির নেতৃত্বে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের কাজে যেন সংঘ সাহায্য করে। কিন্তু হেডগেওয়ার তা করতে অস্বীকার করেন। কেন? আরএসএসের দৃষ্টিভঙ্গিতেই তার কারণ নিহিত আছে। তাদের নেতা গোলওয়ালকর বলছেন, "ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল"(চিন্তাচয়ন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)। অর্থাৎ আর এস এস-এর কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি 'প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন'। অসহযোগ আন্দোলনে যখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু থেকে শুরু করে হাজার হাজার দেশপ্রেমিক মানুষ গ্রেপ্তার হচ্ছেন, পুলিশের অত্যাচার সহ্য করছেন তখন আরএসএস নেতা হেডগেওয়ার বলছেন, "মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে উৎসাহ (জাতীয়তাবাদের জন্য) ক্রমে শীতল হয়ে যাচ্ছিল এবং এই আন্দোলন সৃষ্ট অশুভ শক্তিগুলি সমাজজীবনে বিপজ্জনকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছিল।...অসহযোগের দুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠা যবন-সর্প তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে দেশে দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছিল"(ভিশিকার-১৯৭৯, পৃঃ ৭)। অর্থাৎ আরএসএসের মতে নেতাজি-দেশবন্ধুরাও 'অশুভ শক্তির' প্রতিভূ! বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩তম অধিবেশনে বলেন, "ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধপ্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে।...হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে হবে" (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড-৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দু সভা, পুণা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৬০)। প্রসঙ্গত তখন নেতাজি আজাদ হিন্দ বাহিনীকে নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। সেই সময় আরএসএস তাদের মুখপত্র অর্গানাইজারে কার্টুন এঁকেছিল রাবণের অন্যতম মুখ হলেন নেতাজি। আর আরএসএস তাঁকে তির মেরে হত্যা করছে। এদের উত্তরসূরী বলে গর্বিত বিজেপি এখন নেতাজির ছবি ব্যবহার করে ভোট চাইবে, তা মানতে হবে?

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশ বিভাগের বিরোধিতা করে দেশের নেতাদের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন যাতে দেশ বিভাগ হতে না পারে। কিন্তু তাঁর কথা অন্য নেতারাও যেমন কানে তোলেননি, তেমনই আরএসএস সহ হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম লিগের সাথে গলা মিলিয়ে এই দাবিকে উৎসাহই দিয়েছে। মুসলিম লিগ দেশভাগের দাবি তুলেছিল১৯৪০ সালের মার্চ মাসে। কিন্তু তার ঢের আগে ১৯২৩ সালেই হিন্দু মহাসভার নেতা বি ডি সাভারকার 'হিন্দুত্ব' নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম দুটি পৃথক জাতির তত্ত্ব আনেন। যা দেশভাগের তত্ত্বের জন্মদাতা। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাই বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা"। তিনি আরও বলেছেন, "মুসলিম লিগ সাভারকারের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল"। বিজেপির পূর্বসূরী হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের সাথে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা করেছিল সিন্ধু প্রদেশে এবং বাংলায়। বলেছিল এ হল 'যুক্তিসঙ্গত আপস', অথচ নেতাজি বিরোধিতায় তারা ছিল আপসহীন! সরকারি মসনদের মধু ভোগ করার লোভ কি ধর্মকেও ভুলিয়ে দেয়!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেছিলেন, "এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়" (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ, পৃঃ ১১৬)। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী '৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়তা হবে" (ওই, পৃঃ ৬১)। কীভাবে এই আন্দোলন দমন করা যায় তার একটা তালিকাও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু তখন এই আন্দোলনের মধ্যেই ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের বীজ দেখে বিদেশ থেকেই তাকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ বীরত্বের সাথে লড়াই করছিল, সেই সময় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করার জন্য আগ বাড়িয়ে বললেন, "বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহ-বাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক" (রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লিখিত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পত্র থেকে উদ্ধৃত)। অর্থাৎ হিন্দু মহাসভার সমর্থন নেতাজিকে নয়, ব্রিটিশকে। এখন বিজেপি নেতাজির ছবির পাশে শ্যামাপ্রসাদের ছবি দিচ্ছে। দেশের মানুষ তা মেনে নিতে পারে?

এই হিন্দু মহাসভা ধর্মীয় গোঁড়ামির জিগির তুলে ভোট চাইছে দেখে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন —"সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসীনীদের ত্রিশুল হাতে হিন্দু মহাসভা ভোট ভিক্ষায় পাঠিয়েছেন। ত্রিশুল আর গেরুয়া বসন দেখলে হিন্দু মাত্রেই শির নত করে। ধর্মের সুযোগ নিয়ে, ধর্মকে কলুষিত করে হিন্দু মহাসভা রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে। হিন্দু মাত্রেরই তার নিন্দা করা কর্তব্য"(১২ মে ১৯৪০, ঝাড়গ্রামে প্রদত্ত ভাষণ, আনন্দবাজার ১৪ মে, ১৯৪০)। ভোটের স্বার্থে দাঙ্গার মুখ নরেন্দ্র মোদি অমিত শাহদের সাথে রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ছবি একযোগে ব্যবহার করে বিজেপি যে অশুভ চেষ্টা করছে তাকে প্রতিহত করাও আজ কর্তব্য।

৩০ জানুয়ারি মহামিছিলে সামিল হোন

একের পাতার পর

একচেটিয়া পুঁজির গোলাম এই সরকারকে সরানোই দরকার। কিন্তু কেন্দ্রের সরকারের যে নীতিতে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীকে সেই দাবিতে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে দেখা যাচ্ছে না কেন? এই লড়াইয়ে তো তাঁরা রাজ্যের বেশির ভাগ মানুষকেই পেতেন। তা না করে শিক্ষামন্ত্রী স্কুলছুটের বস্তাপচা তত্ত্ব আবার আওড়েছেন। এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকারও ৩৬ বছর আগে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশটি করার সময় ঠিক এই কুযুক্তিটি

ময়না, পূর্ব মেদিনীপুর

তুলেছিল। কিন্তু পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পরও স্কুলছুট কমার পরিবর্তে তা যে ঊর্ধ্বমুখী, এ সত্য আজ প্রমাণিত। এ রাজ্যের অভিভাবকদের মধ্যে এ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি নেই। তবুও শিক্ষামন্ত্রী সেই বাতিল হওয়া যুক্তিকে আবার আস্তাকুঁড় থেকে তুলে আনলেন। এ থেকেই তো বোঝা যায়, এমন একটি গুরুতর বিষয়ে তাঁরা আদৌ আন্তরিক নন। এরই প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি মহামিছিল।

দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের গরিব মধ্যবিত্ত জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দেশ জুড়ে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৯ সালের শিক্ষার অধিকার আইনে সংশোধন এনে পাশ-ফেল চালু করার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। ওড়িশা সরকার সম্প্রতি ২০১৯-এর শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল চালুর ঘোষণা করেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনও টালবাহানা করে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার এই ঠেলাঠেলি করে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর ক্ষতি করে চলেছে।

সকলেরই মনে আছে, বহু মিছিল-মিটিং-স্বাক্ষর সংগ্রহ-আইন অমান্য সহ দীর্ঘ আন্দোলনের পরও সরকার দাবি মানতে রাজি না হলে ২০১৭ সালের ১৭ জুলাই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এ রাজ্যে সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল। প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চাই— এই দাবিতে সেদিন পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে মানুষ ধর্মঘট সফল করার জন্য যখন প্রস্তুত, সেই প্রবল জনমতের চাপে শিক্ষামন্ত্রী লিখিতভাবে অবিলম্বে পাশ-ফেল চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ওই বছরের ২২ ডিসেম্বর বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিক্ষাবিদ, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি ও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃত্বের যে সভা হয়েছিল তাতে সিপিএম দলের প্রতিনিধি ছাড়া প্রায় সকলেই প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল চালু করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর দলের শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও সহমত পোষণ করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের মানুষ আশা করেছিল, ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্য সরকার পাশ-ফেল চালু করে দেবে। কিন্তু তা তো হয়ইনি, এমনকী আর একটি শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে গেলেও সরকার নিশ্চুপ। একে জনমত বা জনস্বার্থের প্রতি তাঁদের চূড়ান্ত অবজ্ঞা, অসম্মান, প্রতারণা ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

শিক্ষার দাবি ছাড়াও জনজীবনের অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধানও এই মিছিলের দাবি। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির ফলে ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে ঋণের ফাঁদে পড়ে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, লে অফ-লক আউট-ছাঁটাই-এর যাঁতাকলে কর্মচ্যুত শ্রমিক পথে বসেছে। কোটি কোটি বেকার কাজের সন্ধানে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এমনকী বিদেশেও ছুটে যাচ্ছে। আর সরকার চাকরির পরিবর্তে মদের জোগান দিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার মদের দোকান শুধু নয়, কারখানা পর্যন্ত খুলে দিচ্ছে।

আসলে, বেকার যুবক, খেটে খাওয়া মজুর, ফসলের দাম না পাওয়া চাষি, নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা নারী বাঁচল কি মরল— এ নিয়ে কি কেন্দ্র কি রাজ্য, কোনও সরকারেরই কোনও মাথাব্যথা নেই। এদের শুধু চাই ভোট— এমএলএ, এমপি, গদি। তাই লোকসভা নির্বাচনের আগে ভারতের বড়-ছোট, জাতীয়-আঞ্চলিক, এমনকী তথাকথিত বামপন্থী দলগুলিও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে ভোটের নেশায়। কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়, আর কীভাবে ক্ষমতা দখল করা যায়, কার সাথে গেলে দুটো বেশি আসন পাওয়া যায়— মোক্ষলাভের এই উদগ্র লালসায় কোনও নীতি-নৈতিকতা নেই, কোনও জনস্বার্থ নেই। তাই কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে ভোটের স্বার্থেই একদিকে বিজেপির 'রথযাত্রা' তো পাল্টা তৃণমূলের 'পবিত্রযাত্রা'। এর সাথে মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অনাহারে জর্জরিত জনসাধারণের কোনও সম্পর্ক নেই।

একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল উন্নত আদর্শভিত্তিক রাজনীতিকে হাতিয়ার করে জনস্বার্থে লড়াই করে চলেছে। ইতিহাস দেখিয়েছে, একমাত্র সঠিক নেতৃত্বে গণআন্দোলনের দ্বারাই মানুষের দাবি আদায় সম্ভব। দীর্ঘ ১৯ বছর আন্দোলনের পরে ইংরেজি চালু করতে বাধ্য হয়েছিল তৎকালীন সিপিএম সরকার। প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালুর দাবিও গণআন্দোলনের চাপেই সরকারকে মানতে বাধ্য করা সম্ভব হবে। ৩০ জানুয়ারির মহানগরী দেখবে সংগঠিত গণআন্দোলনের সেই রূপ— মহামিছিল। শুরু হবে হেদুয়া পার্ক থেকে। সামিল হবে রাজ্যের প্রতিটি জেলার হাজার হাজার খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষক যুবক মহিলা। আপনিও সামিল হোন দাবি আদায়ের এই মহামিছিলে।

পাশ-ফেলের সঙ্গে স্কুলছুটের সম্পর্ক নেই

এস ইউ সি আই (সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৮ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

"গতকাল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু করার ক্ষেত্রে তাঁরা স্কুলছুটের সমস্যা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। কারণ, পাশ-ফেল চালু হলে নাকি স্কুলছুট বেড়ে যাবে! এ রাজ্যের পূর্বতন সিপিএম সরকারও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সময় ঠিক এই কুযুক্তিটি তুলেছিল। কিন্তু পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পরও বাস্তবে স্কুলছুট কমার পরিবর্তে তা যে ঊর্ধ্বমুখী, এ সত্য অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আমরা তখনই দেখিয়েছিলাম যে, স্কুলছুটের পেছনে শিক্ষার ভার বা ফেল করার সমস্যা কারণ নয়। মূল কারণ দারিদ্র্য। এখনও আমরা দেখছি, যারা সেদিন 'ইংরেজি সাম্রাজ্যবাদী ভাষা'— এ কথা বলে প্রাথমিকে ইংরেজি চালু করার বিরোধিতা করেছিলেন, যার সর্বনাশা ফলাফল আজও এ রাজ্যের কোটি কোটি ছেলেমেয়েদের ভুগতে হচ্ছে, 'পাশ-ফেল চালু করলে স্কুলছুট বাড়বে'— এই যুক্তিটিও তাদেরই। এই যুক্তিও একইরকম বিভ্রান্তিমূলক যা সরকার মেনে নিলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জীবনে অন্ধকারকেই আরও দীর্ঘায়িত করা হবে।

ফলে আমরা শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এ জাতীয় অযৌক্তিক চিন্তার দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার দাবি জানাচ্ছি।"

ঝাড়খণ্ডে দেড় মাস ধরে ধর্মঘটে প্যারাটিচাররা

শিক্ষক আন্দোলনে উত্তাল ঝাড়খণ্ড। ১৫ নভেম্বর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্যারাটিচাররা তাঁদের নানা দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসকে কালো পতাকা দেখালে বিজেপি সরকারের পুলিশ তাঁদের উপর নৃশংস হামলা চালায়। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে শত শত শিক্ষক রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। ২৮০ জন শিক্ষককে হাতকড়া পরিয়ে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা সহ নানা মারাত্মক মিথ্যা অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়। শত শত শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। এসবের প্রতিবাদে রাজ্যের ৬৭ হাজার প্যারাটিচার ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। গত দেড় মাস ধরে তাঁরা ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে রাজ্যের বিজেপি সরকার ৫ হাজার স্কুল বন্ধের নোটিশ দেয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ঝাড়খণ্ডের সমস্ত স্তরের মোনুষ। শিক্ষক আন্দোলনের পাশাপাশি শিক্ষার অন্যান্য দাবিতেও বিক্ষোভ উত্তাল হয়ে ওঠে ঝাড়খণ্ডে। এস ইউ সি আই (সি) এবং তার গণসংগঠনগুলি প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের সামনের সারিতে রয়েছে। (ছবি) ২৩ ডিসেম্বর জামশেদপুরে ডিসি অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

খুনের প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ

২৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দমদমের গোরাবাজার এলাকায় জনবহুল রাস্তার ধারে এক দোকান কর্মীকে দুষ্কৃতীরা গুলি করে খুন করে। থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ঘটনা ঘটলেও পুলিশ প্রায় আধঘন্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দাবিতে দলের দমদম আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে ২৯ ডিসেম্বর গোরাবাজারে মিছিল হয় এবং দমদম থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

দুষ্কৃতী তাণ্ডবের প্রতিবাদে জয়নগরে নাগরিক কনভেনশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর পৌর এলাকায় তৃণমূল আশ্রিত সমাজবিরোধীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় জয়নগর পেট্রল পাম্পের সামনে বোমা-গুলির আক্রমণে ৩ জন নিহত হয়। এর প্রতিবাদে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিদের আহ্বানে ২৪ ডিসেম্বর জয়নগরের রূপ ও অরূপ মঞ্চে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকদের উপচে পড়া ভীড়ের এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক ভূতনাথ মুখার্জী। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর, পৌরপ্রধান সুজিত সরখেল, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নাসিম আহমেদ প্রমুখ। উক্ত খুনের ঘটনা সহ সাম্প্রতিক অতীতের একাধিক খুনের ঘটনা, যুবতী পরিচারিকাকে ধর্ষণ, মহিলার মুখে অ্যাসিড ছোঁড়া, মদ-গাঁজা-জুয়া-সাট্টার ক্রমবৃদ্ধির ঘটনা যে জয়নগরের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তার উল্লেখ করে তরুণবাবু আদর্শভিত্তিক রাজনীতি চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। কনভেনশন থেকে একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। কমিটি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে।

মিউটেশন ফি মকুবের দাবিতে হলদিবাড়িতে কৃষক বিক্ষোভ

এ আই কে কে এম এস হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির ডাকে ২৭ ডিসেম্বর বি এল এল আর ও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। কৃষি জমির মিউটেশন ফি মকুব, খাস জমির পাট্টা প্রদান, বর্গাদারদের উপর থেকে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, ভূমিহীন কৃষকদের বাস্তু পাট্টা প্রদান প্রভৃতি দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্লক সম্পাদক কমরেড সাত্তার সরকার এবং জেলা সভাপতি কমরেড রুহুল আমিন।

সহায়ক মূল্যে ধান কেনার দাবিতে কৃষক আন্দোলন

সহায়ক মূল্যে ধান কেনা সহ একাধিক দাবিতে বিক্ষোভ, ডেপুটেশন ও মিছিল সংগঠিত করল সারা ভারত কিষান ও খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস)। ২৮ ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে সংগঠনের ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বেলদা কেশিয়াড়ী মোড়ে শুরু হয়ে বেলদা শহর ঘুরে ট্র্যাফিক স্ট্যান্ডের কাছে এসে শেষ হয়। ধান নিয়ে চাষিরা মিছিলে হাঁটেন।

বিক্ষোভ সভায় সার-কীটনাশক প্রভৃতি কৃষি উপকরণ সহ কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান বক্তারা। অঞ্চলে সমবায় সমিতিগুলিকে কাজে লাগিয়ে সহায়ক মূল্যে ধান কেনা, কৃষকদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানানো হয়। এদিন নারায়ণগড় ব্লক অফিসে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

ডিএসও-র প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

২৮ ডিসেম্বর ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও-র ৬৫তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসের সামনে পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে মাল্যদান কর্মসূচি পালিত হয়। পরে সেখান থেকে একটি মিছিল কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত যায় এবং কফি হাউসের সামনে সভা হয়। উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে বিক্ষোভ মিছিল, ডি আই ডেপুটেশন ও স্থানীয় সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় ইউনিটের পক্ষ থেকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাখরাবাদের খালিনা বাজারে আটটি দলকে নিয়ে ভলিবল প্রতিযোগিতা হয়। এ দিন বেলদা কলেজ কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

২৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড় থেকে কোর্ট মোড় পর্যন্ত মিছিল ও সমাবেশ হয়। দার্জিলিং জেলা অফিসে শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলিত হয়।

▲ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা

▲ শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা ➤

কলসুরে কৃষক-মজুর সম্মেলনে দুর্বার কৃষক আন্দোলনের শপথ

উত্তর ২৪ পরগণার কলসুরে ২৩ ডিসেম্বর কৃষক-মজদুর সম্মেলনে দাবি ওঠে —রাঘববোয়াল পুঁজিপতিদের কাছ থেকে দশ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ আদায় করে গরিব কৃষকদের কৃষিঋণ মকুব কর, সার-বীজ-কীটনাশক-ডিজেল সহ সমস্ত কৃষি উপকরণের দাম কমাও এবং ধান-পাট-আলু ইত্যাদি কৃষি ফসল লাভজনক দামে কেনার ব্যবস্থা কর।

অগ্নিমূল্যে কৃষি উপকরণ কিনে জলের দরে ফসল বিক্রির ফলে কৃষক সর্বস্বান্ত। ঋণগ্রস্ত কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কোনও আন্তরিকতা নেই কৃষক-মজুর পরিবারগুলিকে বাঁচাবার। আছে শুধু ভোটের বৈতরণী পার হওয়ার জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর ভাষণ।

এই অবস্থায় একমাত্র পথ গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠনের মাধ্যমে নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলে তাদের নিজস্ব দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন পরিচালনা করা। এই পথে কৃষকদের সংগঠিত করে অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠন (এ আই কে কে এম এস) রাজ্যে রাজ্যে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলছে। এদিন সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি কমরেড সেখ খোদাবক্স। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড দাউদ গাজী।

▲ নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর

পাঠকের মতামত

মূর্তি গড়ার টাকায় হাসপাতাল হতে পারত

অবশেষে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করল প্রধানমন্ত্রী মোদিজির হাত ধরে! এমনই শোরগোল উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রচারে। সর্বোচ্চ মূর্তি তৈরি করে ভারত নাকি আমেরিকা, চীন, জাপানকে ছাড়িয়ে শীর্ষে উঠে গেছে!

গত ৩১ অক্টোবর গুজরাতের রাজপিপলাতে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মূর্তির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এবং ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে এই সুবিশাল মূর্তিটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন তিনি। নর্মদা বাঁধের গায়ে মূর্তিটি গড়ে উঠেছে ২০ হাজার বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে। আর মূর্তিকে ঘিরে ১২ বর্গ কিলোমিটারের একটি কৃত্রিম হ্রদও তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিটির উচ্চতা ৫৯৭ ফুট, বেসমেন্ট ৭৯০ ফুট। মূর্তি তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা। সরকারের যুক্তি, উচ্চ মূর্তি নির্মাণে ভারত প্রথম, আর এর জন্য দেশ গর্বিত। তাদের আরও যুক্তি এই মূর্তি তদারকিতে অনেকের কর্মসংস্থানও হবে। কিন্তু এই টাকায় যদি একটি উন্নত হাসপাতাল করা যেত, যদি একটি উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয় করা যেত, যেটির নাম না হয় হত প্যাটেলের নামেই, তা হলে তো দুটো দিক দিয়েই ভারত এগিয়ে যেত। এতে সাধারণ মানুষের যেমন উপকার হত, তেমনি আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কাজ পেত। সাথে সাথে বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপাও হয়ত জুটত। উচ্চ মানের গবেষণা ও শিক্ষার জন্য এখনও যখন বিদেশে ছুটতে হয়, সেখানে মূর্তি গড়ার এই উদাহরণ কি ভারতের পক্ষে গৌরবের? স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভারত জিডিপির মাত্র ১.০২ শতাংশ বরাদ্দ করে, উচিত যেখানে কমপক্ষে ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা। মূর্তি বানানোর ওই টাকায় ২টি ভাল মানের এইমস প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেত, ২ টি আই টি আই প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে পারত। এতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দুটোতেই ভারতের অবস্থার উন্নতি হত।

ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ, নেপাল, ইরাকের থেকেও নিচে। অপুষ্টিতে ভুগছে ভবিষ্যত প্রজন্ম। এ দেশে খালি পেটে রোজ রাতে শুতে যাওয়া শিশুদের সংখ্যাটা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বাড়ছে অপুষ্টি। স্রেফ খেতে না পেয়ে আরও বেশি শুকিয়ে যাওয়া কচি কচি মুখগুলির সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে । অথচ ওই মূর্তির অর্থে পাঁচ হাজারের বেশি শিশুর ভালভাবে সারা জীবনের দায়িত্ব নেওয়া যেত। ৭২৫টি গ্রামের উন্নতি করা যেত। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছে এই মূর্তি। মূর্তিটির নাম দেওয়া হয়েছে 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি'। অথচ ওই মূর্তি স্থাপনের জন্য ওই অঞ্চলের প্রায় ৭৫টি আদিবাসী গ্রামকে কোনও স্থায়ী বসবাসের জায়গা না দিয়েই উচ্ছেদ করা হয়েছে। তাদের প্রতিবাদকে দমিয়ে, আটক করে, কারফিউ জারি করে যে মূর্তির উন্মোচন করতে হয় সেটা আর যাই হোক একতার প্রতীক হতে পারে না।

মেহেদি হাসান মোল্লা
গোসাবা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

পাশ-ফেল চালুর দাবি শিক্ষক সম্মেলনে

২৪-২৬ ডিসেম্বর বহরমপুরের খাগড়া গুরুদাশ তারাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন (জিটিআই) স্কুলে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২৬তম দ্বিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পাশ-ফেল প্রথা অবিলম্বে চালু, কুসংস্কারমুক্ত সিলেবাস প্রণয়ন করার দাবিতে, শিক্ষা ও শিক্ষক বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সম্মেলন আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৪ ডিসেম্বর জেলা শাসক অফিসের সামনে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য সমাবেশ। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সম্মেলন স্থলে 'স্কুল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত শিক্ষাকেই ধ্বংস করবে' শীর্ষক সেমিনারে আলোচনা করেন প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের বিশিষ্ট আধিকারিক তপন কুমার সামন্ত, জিয়াগঞ্জ সিংঘী হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

বিজেপির চমকের রাজনীতির পর্দা ফাঁস

নোট বাতিল-জিএসটি

নিত্যপ্রয়োজনীয় বেশ কিছু পণ্যে জিএসটির হার ১৮ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনল বিজেপি সরকার। ১ জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হবে বলে জানা গেছে। যদিও সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য জিনিস এর মধ্যে কমই আছে। ২৮ শতাংশ পর্যন্ত চড়া জিএসটি চালু করে করে সরকার বলেছিল, এবার জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হবে, ফলে বাজার সংকট কাটবে। এখন আবার তাঁরা বলছেন জিএসটি কমালে জিনিসপত্রের দাম কমবে। জিএসটি চালু করতেই যদি জিনিসপত্রের দাম কমে যায়, তাহলে জিএসটি কমিয়ে দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে কেন বিজেপি সরকারকে? তাহলে কোন কথাটা তাঁদের সত্যি— আগেরটা না এখনকারটা?

জিএসটির দেড় বছরের মাথায় এখন সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কী? ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির বিরাট বাড়তি বোঝা। ওষুধ, দুধ, আটা, ভোজ্য তেল, খাদ্যশস্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য জিনিসের উপর চড়া জিএসটি ধার্য হওয়ায় দাম বেড়েছে অনেক। পোশাক-আসাকেও জিএসটি বাবদ দিতে হচ্ছে বাড়তি টাকা। ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরিষেবা নিতে গেলেই গ্রাহকদের জিএসটি বাবদ বেশি অর্থ গচ্চা দিতে হচ্ছে। বেড়েছে এটিএম ব্যবহারের খরচ, ক্ষুদ্র ঋণ সহ সব ধরনের ব্যাঙ্কঋণের প্রসেসিং চার্জ। জীবনবিমার প্রিমিয়াম বেড়েছে। পরিবহণে বহু ক্ষেত্রে ২৮ শতাংশ পর্যন্ত জিএসটি দিতে হচ্ছে। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জিএসটি ভারতে। ফলে অন্যান্য খরচের পাশাপাশি পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের খরচও বেড়ে গেছে। সরকার বলেছিল, পণ্য বিক্রি ও পরিষেবার জন্য কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, ভ্যাট, পরিষেবা কর ইত্যাদি নানা নামের করের বদলে শুধুমাত্র একটি সরল কর জিএসটি দিতে হবে। বাস্তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, জিএসটি একটি অত্যন্ত জটিল করব্যবস্থা।

ভোটের ময়দানে ফয়দা তুলতে নেমে পড়েছে কংগ্রেসও। কংগ্রেস নেতারা বলছেন, আমাদের ১৮ শতাংশের দাবিই মানতে হল বিজেপিকে! ক্ষমতায় এলে জিনিসের দাম সস্তা করতে নতুনভাবে জিএসটি আনবেন বলেও তারা জনসাধারণকে নির্বাচনী চমক দিচ্ছেন। তাঁদের রাজত্বের সময় তো জিএসটি ছিল না, তখন তারা জিনিসের দাম কমাতে পারেননি কেন? আজ তাদের জিএসটি-র অজুহাত দিতে হচ্ছে কেন?

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিসংখ্যান দিয়ে বলেছে, জিএসটি চালু হওয়ায় রাজস্ব বাবদ আয় কমেছে রাজ্য সরকারগুলির। এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করতে সাধারণ মানুষের পরিষেবা খাতে সরকারি ব্যয় কমছে। আবার এই অজুহাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে সড়ক নির্মাণের খরচ এমনকী পানীয় জলের দায়িত্বও সরকার তুলে দিচ্ছে বেসরকারি মালিকদের হাতে। তার খরচ জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষই। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বাড়তি বোঝা মানুষের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

নোট বাতিলের ক্ষেত্রেও তাই। একে একটি যুগান্তকারী, ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। মানুষের অভিজ্ঞতা হল ঠিক উল্টো। জেরবার হয়ে গেল জনজীবন। শ্রমিক-কৃষক, দোকানদার, ছোট ব্যবসায়ী, ছোট শিল্প সর্বত্র মারাত্মক আক্রমণ হিসাবে নেমে এল। কাজ হারালেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। অসংখ্য সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ হল। এরই প্রতিফলন ঘটেছে সরকার স্বীকৃত সংস্থার রিপোর্টে। অল ইন্ডিয়া ম্যানুফ্যাকচারার্স অর্গানাইজেশন (এআইএমও) নামের সংস্থাটি সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রায় ৩৫ হাজার ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সংস্থার উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, নোট বাতিল-জিএসটি কমিয়েছে কর্মসংস্থান। অতি ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ, ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ, মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে ২৪ শতাংশ এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে ৪৩ শতাংশ কাজ চলে গেছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রে। যেমন— সেলাই কারখানা, দেশলাই কারখানা, প্লাস্টিক কারখানা, বাজি কারখানা, ট্যানারি ইত্যাদি। 'নোটবন্দির ফলেই অর্থনীতির ইঞ্জিন বিগড়ে গিয়েছিল'— ২০১৭-১৮ সালের আর্থিক সমীক্ষা পেশ করতে গিয়ে এ কথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। আবারও সমীক্ষা রিপোর্টে তা প্রমাণ হল।

২০১৬ সালের নভেম্বরে নোট বাতিল ঘোষণা করে সরকার। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন মার খাবে, দেশের সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়বে— একথা তখনই বারবার মানুষের কাছে তুলে ধরেছিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)। এই সিদ্ধান্ত যে কালো টাকার কারবারিদের সুবিধা দিতে, তাদের কালো টাকাকে সাদা করতে, এ কথাও দলের প্রচারপত্রে বলা হয়েছিল। সাধারণ মানুষকে নিয়ে সারা দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল সরকারের এই জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। আর কোনও দল এর বিরুদ্ধে এভাবে পথে নেমে প্রতিবাদ করেনি। এসইউসিআই(সি) মার্কসবাদ-লেনিনবাদের গভীর উপলব্ধি থেকেই বুঝতে পেরেছিল, এতে সাধারণ মানুষের ক্ষতিই হবে, বিজেপির এই সিদ্ধান্ত মালিক শ্রেণির পক্ষে। সেটাই আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। একের পর এক অর্থনীতিবিদ যাঁরা নোট বাতিল ও জিএসটি চালুর কট্টর সমর্থক ছিলেন, তাঁরাও বিরোধিতা করে সরকারের নানা দপ্তর থেকে পদত্যাগ করছেন। শুধু তাই নয়, এতে যে অর্থনীতির কিছুমাত্র উন্নতি হবে না, এসইউসিআই(সি)-র এই মূল্যায়নও আজ সম্পূর্ণ সত্য প্রমাণিত।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বতন গভর্নর রঘুরাম রাজন নোট বাতিলে সিলমোহর দিলেও পদত্যাগের পরে বলেন, ভারতীয় অর্থনীতির চাকা মাটিতে গেঁথে যাওয়ার জন্য নোটবন্দি ও তড়িঘড়ি জিএসটি চালুর জোড়া ধাক্কাই দায়ী। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, সরকারের ভূতপূর্ব মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যনের পদত্যাগ এবং নোট বাতিলকে 'ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত' তকমা সরকারের ভুল সিদ্ধান্তকেই প্রমাণ করেছে। বিজেপির সমর্থক তাবড় কর্পোরেট কর্তা থেকে শুরু করে সরকারি আধিকারিক, যাঁরা ডিমনিটাইজেশনের কট্টর সমর্থক ছিলেন, তাঁরাও একে একে এর বিরোধিতা করছেন। আসলে বিজেপি নেতারা কিছু একটা করে দেশের মানুষকে চমকে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা যে জনমনে এমন প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা তাঁরা বুঝতে পারেননি। আজ ধাক্কা খেয়ে ঢোক গিলে তাদের বলতে হচ্ছে— নোট বাতিল ও জিএসটি চালু সঠিক ছিল না।

আসলে কংগ্রেস, বিজেপি সকলেই ধনিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে। শ্রেণিবিভক্ত বুর্জোয়া রাষ্ট্রে যে কোনও আর্থিক সংস্কারই ক্ষমতাসীন সরকার করে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে। সোজা কথায়, মালিক শ্রেণির সেবাদাস সরকার আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে। কিন্তু তা তারা করে জনগণের স্বার্থরক্ষার ঢাক বাজিয়েই। দেশের কর্পোরেট পুঁজিপতিদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল জিএসটি চালুর। বিজেপিও সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তাদের সাহায্যের রিটার্ন দিল। আর নোট বাতিল করে শিল্পপতিদের অনাদায়ী ঋণের বোঝায় ধুঁকতে থাকা ব্যাঙ্কগুলিকে সাময়িক ভাবে চাঙ্গা করা হল। সাথে সাথে ক্ষমতার গদি আঁকড়ে থাকতে জিএসটি-নোট বাতিলের জোড়া চমকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল বিজেপি। কিন্তু তাদের চমকের রাজনীতি জনগণ ধরে ফেলেছে।

মদ নিষিদ্ধ করায় বিহারে অপরাধ কমেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার করবে না কেন?

বছর চারেক আগে বিহার সরকার মদ নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করেছিল। জনমনে এই দাবিটি ছিল বহুদিনের। সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা, যাদের স্বামীরা মদে আসক্ত, এই দাবিটি নিয়ে দীর্ঘদিন সরব ছিলেন। তাঁদের লাগাতার আন্দোলনের চাপেই বিহার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল।

স্বল্প মজুরির শ্রমিক, আয়হীন কৃষক, হতাশায় নিমজ্জিত বেকার যুবকেরা অনেকেই তাঁদের জীবনযন্ত্রণার জ্বালা জুড়োতে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকার পথ বেছে নেন। তাদের সামান্য রোজগারের বেশিরভাগটাই চলে যায় মদের ঠেকে। ফলে সাংসারিক অশান্তি হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। এই পরিবেশে শিশু এবং মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিতা হন। ঘরে-বাইরে তাঁদের নির্যাতন যেন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের যে কোনও রাজ্যের মতো বিহারের পরিস্থিতিও ছিল ঠিক একই রকম, বরং কিছুটা বেশি খারাপ। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্রের সংসারের কোণ থেকে উঠে আসা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল শিক্ষার আলো বঞ্চিত, আর্থিক শোষণে নিষ্পেষিত, জীবনযুদ্ধে জেরবার গ্রামীণ মহিলাদের সোচ্চার প্রতিবাদের মধ্যে। প্রতিবাদের এই স্বরকে ভোটলোভী ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতারাও উড়িয়ে দিতে পারেনি। সরকারকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল মদ।

আজ চার বছর পর বিহার সরকারের মহিলা বিকাশ নিগমের অধীনস্থ জেন্ডার রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষা বলছে, রাজ্যে যেখানে ৫৪ শতাংশ পরিবারে মহিলা এবং শিশুরা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার ছিলেন, তা কমে এখন ৫ শতাংশ পরিবারের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। সংসারে অশান্তি বেশ কিছুটা কমেছে। এর আগে ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের রিপোর্টও দেখিয়েছে, মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিহারে ৫৫ শতাংশ পথ দুর্ঘটনা, ২৪ শতাংশ হত্যা, ১৬ শতাংশ লুঠ ও ৩৭ শতাংশ মারামারির ঘটনা কমেছে। এই অভিজ্ঞতার পর তামিলনাড়ু সরকারও জনমতের চাপে মদের উপর লাগাম টানতে বাধ্য হয়েছে।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে মদ তৈরি বা বিক্রির উপর নিয়ন্ত্রণ দূরের কথা, তৃণমূল সরকার মদকে সম্ভাবনাময় শিল্প হিসাবে দেখছে। মদ বিক্রি করেই সিংহভাগ রাজস্ব আদায়ের পরিকল্পনা করছে। রাজস্ববৃদ্ধির অজুহাতে নতুন করে ১২০০ মদের দোকানের লাইসেন্স দিচ্ছে। এমনকী সরকার নিজেই পাইকারি মদের ব্যবসায় নামছে। নতুন নতুন মদের কারখানা খোলার কথা বলছে। জেলায় জেলায়, এমনকী প্রত্যন্ত গ্রামেও কী করে মদ পৌঁছানো যায়, সেই চিন্তায় সরকারের ঘুম নেই। অজুহাত হিসাবে দেখানো হচ্ছে বিষাক্ত চোলাই মদ খেয়ে একের পর এক মৃত্যু মিছিলকে। ভাবখানা এমন সরকার যেন নিতান্তই দয়া পরবশ হয়ে বিশুদ্ধ মদ মানুষের হাতে তুলে দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়েদের উন্নত শিক্ষা, মানুষের উন্নত চিকিৎসা, উন্নত পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, উন্নত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, উন্নত সেচ ইত্যাদি নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা দেখা যায় না।

এ রাজ্যে খুন-ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। প্রতিদিন দুই বছরের শিশু থেকে শতায়ু বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, ধর্ষণ-নারী নির্যাতনের ঘটনার ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধীরা মদ্যপ। মদের প্রসার এতটাই ভয়াবহ ভাবে বেড়েছে, কিশোর-কিশোরীদেরও তার থেকে মুক্ত রাখা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক কালে এক কিশোরীর জন্মদিনের পার্টির হুল্লোড়ে মদের নেশায় আচ্ছন্ন এক কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যু, দমদমের স্কুলে ক্লাসরুমে বসে কিশোরীদের মদ্যপানের ঘটনায় বিবেকবান মানুষ মাত্রেই আঁতকে উঠেছেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের যৌবনকে ধ্বংস করে মদ বেচা পয়সায় সরকার মানুষের কল্যাণ করবে?

মদ স্নায়ুর উপরে ক্রিয়া করে মানুষের বোধশক্তি-সংযম-ন্যায়নীতিবোধ অকেজো করে দেয়। মদ্যপদের বেপরোয়া করে তোলে। সেই সময় কোনও চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ করতেও তাদের বাধে না। এর সাথে শাসক দলের প্রশ্রয়, সমাজের উপর তলার সাথে দুষ্কৃতীদের যোগসাজসে যা খুশি করার অবাধ সুযোগের মেলবন্ধন ঘটলে সমাজে এক ভয়াবহ দুষ্ট শক্তির জন্ম হয়। যা সমাজ পরিবেশকে বিষিয়ে তোলে। ভোটের সময় ভোটবাজ দলগুলি এই দুষ্ট শক্তিকে ব্যবহার করার লক্ষ্যে তাকে প্রশ্রয় দেয়। গণআন্দোলনের জমিকে নষ্ট করতেও এই প্রশ্রয় কাজ দেয়। যে কারণে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে ঝান্ডার রঙ নির্বিশেষে শাসকদলগুলি মদের প্রসারের জন্য কাজ করে যায়।

আশার কথা, মদের প্রসারের বিরুদ্ধে বহু জায়গায় সাধারণ মানুষ বিশেষত মহিলারা রাস্তায় নামছেন। মদের ঠেক ভাঙতে, মদের ঢালাও লাইসেন্স রুখতে তাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। মা-বোনেদের পণ— তাঁদের সন্তান ও ভাইদের আর সর্বনাশ হতে দেবেন না। এআইএমএসএস এই আন্দোলনকে রাজ্য ভিত্তিতে সংগঠিত রূপ দিতে উদ্যোগ নিয়েছে। প্রয়োজন জনগণের সহযোগিতায় এই আন্দোলনের দ্রুত শক্তিশালি করা।

ধর্মঘট সফল করুন

প্রথম পাতার পর

মালিক শ্রেণি ও তার সেবক সরকার শ্রমিকদের দাবির প্রতি কোনও গুরুত্বই দেয়নি। সরকার শ্রমিকদের দাবি শুধু উপেক্ষাই করেছে তাই নয়, আরও বেশি বেশি মাত্রায় আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। যার ফলে ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়েছে। তবুও পুঁজিপতি শ্রেণির সেবায় নিবেদিত সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে কোনও পদক্ষেপই নেয়নি, মালিক শ্রেণিকেও শ্রমিকদের স্বার্থ বিবেচনার জন্য কোনও চাপ দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে ৮-৯ জানুয়ারি ২০১৯ আরেকটি বনধ ডাকা হয়েছে।

সরকার ও মালিকপক্ষের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী মনোভাবের কারণে আগের ধর্মঘটগুলিতে দাবিগুলির মীমাংসা না হলেও তার অনেক সাফল্য রয়েছে। ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকরা দেখিয়ে দেয় উৎপাদনের আসল শক্তি তারাই, মালিকরা নন। প্রতিটি ধর্মঘট ব্যক্তি শ্রমিককে উপলব্ধি করায় তাঁরা একা নন। ধর্মঘটের সময় শ্রমিকরা সহজেই বুঝতে পারে কে তার শত্রু, কে মিত্র। ধর্মঘটে মজুরি মার গেলেও শ্রমিক বুঝতে পারে, ভয়ঙ্কর শোষণ থেকে মুক্তি পেতে এ তার প্রয়োজন। ধর্মঘট শ্রমিক জীবনে নিয়ে আসে সাহস। পুঁজির নির্যাতন থেকে মুক্তির চিন্তা শ্রমিকদের মধ্যে এনে দেয় ধর্মঘট।

আবার শুধু ধর্মঘট করলেই, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবি দাওয়া নিয়ে মারমুখী লড়াই করলেই শ্রমিকের মুক্তি হবে না। শ্রমিককে বুঝতে হবে, ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমিককে দেখাতে হবে, কেন শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই তাদের জীবনের দুঃসহ অবস্থার জন্য দায়ী। আর এই শোষণ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করতে হলে মজুরদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সংগঠনের বা সংগ্রাম কমিটির জন্ম দিতে হবে। ধর্মঘটের সাথে সাথে এই কাজটি করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বর্তমানে বেশিরভাগ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রমিকদের বলেন, আমার ইউনিয়ন কর, এই সুবিধা পাবে, সেই সুবিধা পাবে। শাসকদলের ট্রেড ইউনিয়ন যেমন বলে, আমরা সরকারে আছি, শ্রমিকদের বেশি সুবিধা আমরাই দিতে পারি। এখন যেমন বলছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন। আগে যেমন বলেছে সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্পর্কে কার্ল মার্কসের বক্তব্য ছিল —শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করবে, কারণ এটা হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম'। সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের হাতেখড়ি হয় এখানে। সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিদিনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শ্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণের, সত্যানুসন্ধানের সুযোগ পায়। সে বুঝতে পারে কেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই। যথার্থ বিপ্লবীরা ছাড়া আর কেউই প্রতিদিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চায় না। বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাকে হাতিয়ার করে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন এ আই ইউ টি ইউ সি শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৮-৯ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের প্রচারে ২৭ ডিসেম্বর ব্যারাকপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য

৮-৯ জানুয়ারির ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ইউনিয়নগুলি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সারা বাংলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়ন, সারা বাংলা মোটর ভ্যান চালক ইউনিয়ন, সারা বাংলা টোটো চালক ইউনিয়ন, অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়ন, সারা বাংলা আশাকর্মী ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন, সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়ন, আই ডি বি আই কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার মেন্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কোলিয়ারি ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি, কোল মাইনার্স ইউনিয়ন, সি টি সি ট্রাম সমন্বয় সমিতি, গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, লরি ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (ওয়েস্ট বেঙ্গল), অল ওয়েস্ট বেঙ্গল প্যারা-মেডিক্যাল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, সারা বাংলা প্রাণীবন্ধু কর্মচারী ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি কন্ট্র্যাক্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, পৌরকর্মী ইউনিয়ন, ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপার কর্মচারী ইউনিয়ন, নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সহ জেলাভিত্তিক সমস্ত এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ধর্মঘটকে সফল করার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে।

বেতন কমানোর প্রতিবাদ

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এটিএম গার্ডদের ডেজিগনেশন পরিবর্তন করে হাউসকিপিং স্টাফ হিসাবে দেখিয়ে তাদের বেতন এক ধাক্কায় ৩ থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অন্যায় বেতন ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ২৮ ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম কলকাতার বিবাদী বাগে বিক্ষোভ দেখায়। স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মী ছাড়াও অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঠিকা শ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করেন। এসবিআইয়ের চিফ জেনারেল ম্যানেজারের নিকট পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি চাই
বিশাল মিছিলে দাবি মিড-ডে মিল কর্মীদের

২৮ ডিসেম্বর রাজ্যের নানা জেলা থেকে আগত ৬ সহস্রাধিক মিড-ডে মিল কর্মী কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেন (ছবি প্রথম পাতায়)।

কেরালার মতো রাজ্য মিড-ডে মিল কর্মীদের মাসে সাড়ে ৬ হাজার টাকা ভাতা দিলেও পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা পান মাত্র দেড় হাজার টাকা। এটুকু পেতেও অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস। মিড-ডে মিলে বরাদ্দ ছাত্র পিছু মাত্র ৪ টাকা ৩৫ পয়সা। এর ফলে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের যথাযথ পুষ্টিকর খাবার দেওয়া সম্ভব হয় না, পাশাপাশি রান্নার উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। এর ফলে রান্নায় যুক্ত কর্মীদের পরিশ্রম বাড়ে। এর উপর কেন্দ্রীয় সরকার মিড-ডে মিলকে এন জি ও-র উপর ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সরকারের কোনও দায় দায়িত্বই কার্যত থাকছে না। মিড-ডে মিল কর্মীদের ছুটি, ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা, পি এফ ইত্যাদি এমনিতেই নেই। আর সরকার হাত তুলে নিলে ভাতটুকুও জুটবে না।

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সভাপতি অশোক দাস। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য। সংগঠনের সহ সভাপতি সনাতন দাস, রাজ্য সম্পাদিকা চপলা বর প্রমুখ নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। মিড-ডে মিল কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি, মাসিক ১৮ হাজার টাকা বেতন, ছাত্র অনুপাতে কর্মী নিয়োগ সহ ১৩ দফা দাবিতে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

আগামী ২৮ জানুয়ারি পার্লামেন্ট অভিযানে কর্মীদের সামিল হওয়ার আবেদন জানান নেতৃবৃন্দ।

শিশু ও নারী পাচার বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে বনানী নার্সিংহোমে দীর্ঘদিন শিশু পাচার চক্র চললেও প্রশাসন চোখ বুজে থেকেছে। ঘটনা জানার পর থেকেই এর বিরুদ্ধে নাগরিকরা আন্দোলনে নেমেছেন। এ আই এম এস এসের নেতৃত্বে মহিলারা রাস্তা অবরোধও করেন।।

২৩ ডিসেম্বর অশোকনগর শ্রীমা বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় শিশু ও নারী পাচার বিরোধী নাগরিক কনভেনশন। শতাধিক মহিলা ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতিতে এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি তপনকুমার বিশ্বাস, ডাঃ স্বপন চৌধুরী, শতরূপা ঘোষ, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির নেত্রী পুতুল চৌধুরী প্রমুখ। অনুপা ঘোষকে সভাপতি এবং সুজাতা দাস গোস্বামী ও লক্ষ্মী করকে যুগ্ম সম্পাদক করে 'শিশু ও নারী নিগ্রহ বিরোধী কমিটি' গঠিত হয়।

ন্যূনতম মজুরি চালুর দাবি হোসিয়ারি শ্রমিকদের

রাজ্যের হোসিয়ারি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত (সর্বশেষ) ন্যূনতম মজুরি অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে ২০ ডিসেম্বর ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের এক প্রতিনিধি দল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইউনিয়নের সভাপতি দিলীপ ভট্টাচার্য, সম্পাদক দীপক দেব, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সভাপতি মধুসূদন বেরা, উপদেষ্টা নারায়ণচন্দ্র নায়ক, সম্পাদক নেপাল বাগ প্রমুখ। মন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দপ্তরের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে নির্দেশ দেন এবং সেই ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষিক মিটিং ডাকার নির্দেশও দেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি যেখানে প্রত্যহ ৩২৯ টাকা, সেখানে বর্তমানে মেকার মালিকরা দিচ্ছে মাত্র ২৬৬ টাকা। অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি কার্যকর না করলে শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন বলে নেতৃবৃন্দ জানান।

প্রকাশিত হল

মূল্য ১০টাকা

পাশ-ফেল চালুর দাবিতে দিল্লিতে ধরনা

অবিলম্বে প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ- ফেল চালু, শিক্ষার বেসরকারিকরণ বন্ধ, উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত বাতিল, সিবিসিএস ও সেমেস্টার সিস্টেম বাতিল, ইতিহাস বিকৃত করে শিক্ষার উপর আঘাত বন্ধ করা প্রভৃতি দাবিতে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির ডাকে ২১ ডিসেম্বর দিল্লিতে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে অনুষ্ঠিত ধরনায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। দিল্লি ও পাশের রাজ্যগুলি থেকেও শিক্ষানুরাগীরা সামিল হন। ধরনা থেকে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এ আই ডি এস ও-র অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্মেলন

অন্ধ্রপ্রদেশের কুরনুলে ২২-২৩ ডিসেম্বর এআইডিএসও-র রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ছাত্র মিছিল

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন সিপিডিআরএস-এর

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে। শিয়ালদহের বিগ বাজার সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ডের কাছে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর কলকাতা জেলার উদ্যোগে এক পথসভা আয়োজন করা হয়। সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সদানন্দ বাগল এই সভায় নানা দিক থেকে আলোচনা করে দেখান, কী ভাবে ভারত সহ গোটা দুনিয়া জুড়ে মানুষের অধিকার আজ চরম সংকটের মুখে। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক সুবোধ বসু রায় বলেন, মানবাধিকার সম্পর্কিত আইনি ধারা ভারত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়মমাফিক মেনে নিলেও প্রায় ক্ষেত্রেই বাস্তবে তার মান্যতা দেওয়া হয় না। এমনকী বিরোধীদের পথসভা আটকানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মেইন্টেন্যান্স অফ পাবলিক অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ২০১৭' নামক স্বৈরাচারী আইন পাশ করিয়েছে।

পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে ১১ ডিসেম্বর সকালে সুসজ্জিত পদযাত্রার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সভাপতি ডি পি চক্রবর্তী এবং শম্পা দত্ত ও মণিলাল মাজী। ১০ ডিসেম্বর আদ্রা শহরেও কর্মসূচি পালিত হয়।

৮ ডিসেম্বর সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর শাখা এবং জেলার 'শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী ও বুদ্ধিজীবী মঞ্চ'-এর যৌথ উদ্যোগে রূপশ্রী সিনেমা সংলগ্ন হলে সভা হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং মানবাধিকার রক্ষার দাবিতে আলোচনায় অংশ নেন সিপিডিআরএস-এর পক্ষে অধ্যাপক সঞ্জীব কুইল্যা, সুশীল দাস, মঞ্চের পক্ষে ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, মানিক মাইতি প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সিপিডিআরএস-এর তমলুক শাখার সভাপতি রঞ্জিত জানা।

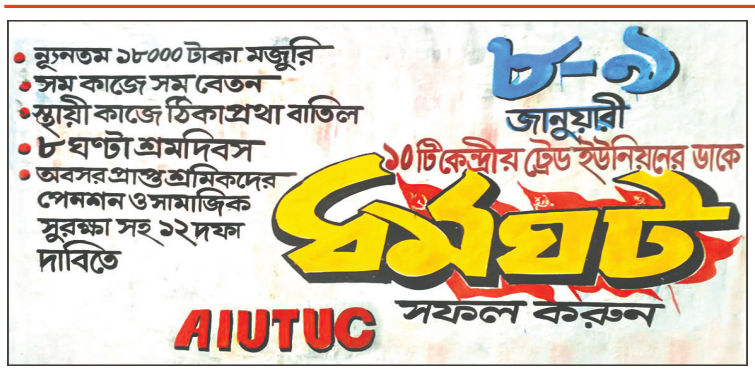

ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com